International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-IV, May 2017, Page No. 9-30
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

চন্দ্রানী বর্মন
গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

The world 'Imperialism' is much talked about in today's world. It is a tool to acquire other's states for one's economic benefit. Lenin famously said "Imperialism is the highest stage of capitalism". Imperialism, thus, can be considered a typical capitalistic scheme.
The aggression of colonialisation spread across many countries and India, too, was not spared from its curse. After the Battle of Plassey in 1757 AD, the East India Company started to colonise India. This exploitation started influencing India's politics, economic, religion, social structure, literature, art and culture.

In the history of Bengali literature, amongst all the writers of importance, Saratchandra Chattopadhyay was a humanitarian writer. In his writing, we find stories of the section of people, who were deprived and exploited. The pains and sorrows of these people which were grossly overlooked in the-then art and literature, however Saratchandra was uninhibited in telling their stories.

In 1919, Saratchandra Chattopadhyay joined National Congress, and with the help of Chittaranjan Das, he gradually became an active member of the party. Gandhi inspired him to join the non-cooperation movement, and gradually, he became so involved in politics, that he was elected the President of the Howerah Jila committee. Gradually he started entering national level politics.

In this time, although he was neck-deep in political activism, he wrote 'Nari'r Mulyo' and 'Dena Paona'. It is also during this time that he started writing the likes of 'Srikanto' (the third part), 'Pather Dabi', 'Nababidhan', 'Jagaran' etc. In all these novels, although we find manifestation of imperial ideologies, 'Pather Dabi' stood out as an exceptional creation that would not only be revered as classic literature, but also became the handbook of revolution to the Bengali youth. And although the British government banned the novel, it created a nationwide wave of commotion. The novel, later free from its ban, continues to attract readers with its literary quality and revolutionary content.

সাম্রাজ্যবাদ কথাটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়, সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয় এবং এই অভিপ্রায় সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা সামরিক কারণের উপর ভিত্তি করে। অবশ্য এই সকল কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থটি প্রধান। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ হল অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে পররাজ্য গ্রাস

করার একটি পদ্ধতি, যার ফলে অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসী বা আগ্রাসনকারী জাতি বা তার সরকারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। লেনিনের "Imperialism- the highest stage of capitalism" গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক দিকটির উপরেই মূলত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায় বা একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এই পর্যায়ে দেশের উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পুঁজিপতিদের হাতে শিল্প ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মালিকানা থাকায় অপরিমেয় মহাজন পুঁজির সৃষ্টি হয়। তখন স্বদেশের বাজার অতিক্রম করে বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমে একটি দেশ অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করে। এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন রূপে তার শক্তি ও প্রতিপত্তি কায়েম করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতা বিস্তারের মোহে একের পর এক রাষ্ট্রকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করতে চেষ্টা করে। অপরদিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের অধিবাসীগণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করে।। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন ঘটতে থাকে। অবশ্য এর আগেও ১৭৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার তেরোটি দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রসার ঘটানোর জন্যই বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তারা অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটায়। ঐ অঞ্চলের মানুষ পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদির ধারণা সম্পর্কে অবহিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সমানধিকারের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। যে জাতীয়তাবাদ উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্ররোচিত করেছিল, সেই জাতীয়তাবাদই উপনিবেশগুলির অধিবাসীগণকে উপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণির মানুষই অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য উপজাতি প্রধানের কর্তাব্যক্তিরা জমিদাররা স্থানীয় বুর্জোয়াদের কিছু অংশ এবং বিদেশী কোম্পানীর কর্মচারীরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরোধিতা করলেও দেশপ্রেমের উন্মাদনায় অনেকে ক্ষেত্র বিশেষে এই মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলেন। এই মুক্তিসংগ্রামের আন্দোলনে দেশের প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণিই অংশগ্রহণ করেছিল।। ভারতবর্ষে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করতে থাকে। ফলস্বরূপ এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতবর্ষের অর্থনীতি, রাজনীতিও সমাজনীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের আমলটি ছিল অবাধ লুণ্ঠনের যুগ। ব্রিটিশ সরকার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভরতবর্ষ ও চীনদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল। কোম্পানী নিজে ও তার কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ভাবে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে বাংলার রেশমবস্ত্র, ঢাকার মসলীন, পাটনার সূতি বস্ত্র এবং বিহারের নীল ও সোরা প্রভৃতি পন্য দ্রব্য ব্রিটেনসহ ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ীদের বাংলার নবাবদের উচ্চহারে শুল্কদিতে হত বলে তারা কোম্পানীর সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করে। এই অসম বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করে। এই অসম বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলার নবাবদের কাছ থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একবছর, পাঁচবছর প্রভৃতি মেয়াদে নিলাম ডেকে ইজারাদারদের জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে কোম্পানী বিপুল লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের শিল্প পতিদের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয় বাংলার অর্থনীতির উপর এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়। এরপর থেকেই

স্বল্পকালীন সময়ের জন্য জমির ইজারা দেওয়ার প্রথার অবসান ঘটিয়ে বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সংগঠিত করার জন্য ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন ঘটে। যার ফল স্বরূপ বাংলার কুটির শিল্পগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিরাজস্ব নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে যে নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটতে থাকে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন রেল পথ, আধুনিক ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে। উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে পরিবহন ও শিল্পের উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও আংশিক শিল্পায়নের ফলে বাংলায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের সংখ্যবৃদ্ধি ঘটে। এই শ্রেণির মধ্যে উদারনৈতিক মতবাদ প্রাচীন ঐতিহ্যগত গোঁড়ামী ও দেশাত্মবোধের জন্ম হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তি রচনায় বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্ব থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এক সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন, এবং ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। অবশ্য এই সময় সমাজের শিল্পপতি ও উচ্চবিত্ত শ্রেণিরাই কংগ্রেস গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সময় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ দান ও স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে বেশি করে অধিকার দেওয়ার প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের সহজ পথই অনুসরন করা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ জুড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত হয় এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করা হয়। অবশেষে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রদ হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুটি অংশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার জাতীয় রাজনীতির ভাগ্যাকাশে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তারই মধ্যে মধ্যবিত্ত প্রভাবিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন দেশের মধ্যে মূলত যুবক সমাজকেই উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল।

শরৎচন্দ্র যখন বার্মা ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধি ও কংগ্রেস নেতারা নিঃশর্তে অকুণ্ঠভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করেছিল। মহাত্মা গান্ধি ইংরেজদের পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সৈন্যসংগ্রহ করতে গিয়ে গুজরাটের কৃষকদের বলেছিলেন যে, যুদ্ধে যোগ দিলে 'স্বরাজ' লাভ সম্ভব হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্নরূপ। যুদ্ধের রসদ জোগাতে গিয়ে দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে রজনীপাম দত্ত বলেছিলেন "The very heavy burdens of crippling financial contributions exacted from the poverty stricken people of India for the service of the war, the rising prices and the reckless profiteering created conditions of mass misery and impoverishment, which were reflected in the unparalleled toll of the influenza epidemic at the end of the war killing 14 million, the growth of unrest was reflected in the Ghadr movement in the Punjab, and in mutinies in the army which were suppressed with ruthless executions and sentences."[১]

যুদ্ধশেষে সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভ আরো তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধকালীন বছরগুলোতে এদেশে শিল্পের বিস্তার ও শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। শিল্পবাণিজ্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধিতে পুঁজিপতিরা প্রচুর মুনাফা লুঠতে থাকেন। অপরদিকে জীবনযাত্রায় দ্রুত ব্যয়বৃদ্ধিতে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত আন্দোলনও তীব্রতা লাভ করে। ফলে যুদ্ধ শেষে সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। বাংলার যুবশক্তির মধ্যে আগে থেকেই বিপ্লবের প্রতি প্রচণ্ড

আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। এই সময়ই বালেশ্বরে বাঘা যতীন সদলে লড়ে প্রাণ দেন। এই বিপ্লবী শক্তিকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার দমনমূলক রাউলাট আইন পাশ করান, যার প্রতিবাদে নানা জায়গায় হরতাল পালিত হয়। ইংরেজ সরকার মারমুখী হয়ে ওঠে, যার নৃশংস প্রকাশ ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এই সময় মহাত্মাগান্ধি নীরব থাকলেও ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকার দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন।

এই সকল ঘটনা শরৎচন্দ্রকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে ছিল ১৯১৯ সালে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৯ সাল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ঐ বছর ইংরেজ সরকার রাউলাট আইন পাশ করে জনগণের উপর দমননীতি প্রয়োগ করে। এই আইনের ফলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা, আদালতের প্রচলিত নিয়ম অস্বীকার করা এবং সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। মহাত্মা গান্ধি রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্দেশে 'সত্যাগ্রহী সঙ্ঘ' গঠন করেছিলেন। এই সময় দেশের মধ্যে ভারতবাসীদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা এবং অপরদিকে রাশিয়ায় জারের পতন ইংরেজ সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তারা কথায় কথায় 'সিডিশানের' নামে সত্য ও কণ্ঠরোধের যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র 'সত্য ও মিথ্যা' (বাংলার কথা, ২০ মাস ও ৫ ফাল্গুন ১২৩৮) প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে লেখক কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার দেন তা নয়। তৎকালীন দেশীয় মানুষরা ইংরেজ শাসকের এই অন্যায় অত্যাচারকে বিনাবাধায় মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন অভিজ্ঞতা পূর্ণ, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ এবং সম্ভ্রম কি ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা দেখার মত চোখ যেমন তার ছিল তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল নিবিড় ভালোবাসা ও সহানুভূতি। তার স্পর্শকাতর মন একদিকে চেয়েছিল দেশীয় সমাজ শাসনের হাত থেকে মুক্তি অপরদিকে বিদেশী শাসন শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি, অবশ্য শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবেশ ঘটে 'নারায়ন' পত্রিকার সম্পাদক দেশবন্ধুর সঙ্গে 'স্বামী' গল্পটির প্রকাশের সূত্র ধরে, এর পর থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধিজির আহ্বানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ খ্রিঃ গান্ধির নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয় তার মূল লক্ষ্য ছিল Attention of Swaraj by peaceful and non-violent mean অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও শোষনের অবসান ঘটিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা, কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সেই শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সংগঠিত করল।

গান্ধিজি সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলনের দুটি নীতি ছিল একটি ছিল বয়কট দ্বিতীয়টি হল স্বদেশী। যার ফলে গান্ধিজি ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। ইরেজদের গোলামখানা ছেড়ে বহু ছাত্র বেড়িয়ে আসেন এবং তাদের জন্য দেশবন্ধুর উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফরবিজ ম্যানসনের বিরাট অট্টালিকায় 'গৌরিয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। গান্ধিজি এই বিদ্যালয়টি উদ্ঘাটন করেন, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল আর শরৎচন্দ্র ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। তাছাড়া মাখনলাল সেন, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী, অমূল্য চন্দ্র সেন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন মহিলারও কিন্তু এই আন্দোলনে দূরে সরে থাকেননি। তারাও আন্দোলনে যথেষ্ট অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। কি ভাবে মহিলাদের রাজনীতিতে যুক্ত করা যায় এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন শরৎচন্দ্রকে দায়িত্ব দেন, শরৎচন্দ্র এদের জন্য 'নারী কর্ম মন্দির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সংস্থাটির পরিচালনার দায়িত্ব দেন দেশবন্ধুর বোন উর্মিলা দেবী ও স্ত্রী বাসন্তী দেবীর উপর। অবশ্য প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম থাকলেও পরবর্তী কালে এই সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায় অবশ্য শরৎচন্দ্র কখনই সংখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন "যুগযুগান্তর ধরে যারা ঘরের বাইরে পা দেয়নি।। রান্নাঘর ও প্রসুতিঘর পর্যন্ত যাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত ছিল, তাদের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সহস্র সৈনিক কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু পদ্ম তো কাদায় ফোটে। একদিন দেশের অন্তপুর থেকে নিশ্চই ফুটে বেরবে"[২] গান্ধিজির আহ্বান সেই প্রথম মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে রণভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই সময় অসহযোগ আন্দোলন দেশের মধ্যে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল বহু নর-নারী যুবক যুবতী এই আন্দোলনে বিশেষ অগ্রনী ভূমিকা নিলেন। শরৎচন্দ্রও নিজে সাহিত্য সাধনা ছেড়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে অসহযোগী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে অসহযোগী আন্দোলনের সঞ্চালক ছিলেন দেশবন্ধু। খাদি নির্মিত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যে সকল স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রেফতার হন তার মধ্যে দেশবন্ধুর ছেলেও ছিলেন। এর পর দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও বোন উর্মিলা দেবী এই আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার নেন। অবশ্য ঐ দিনই যুবরাজ কলকাতায় আসেন এবং ধর্মঘাট করার অপরাধে বাসন্তী দেবীকে গ্রফতার করা হয়। সারা বাংলা এই ঘটনায় বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে ফৌজদারী আইন জারি হওয়ার ফলে কংগ্রেসের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। দেশবন্ধু এই সময় সংগঠনটি আরো দৃঢ় করে গড়ে তোলেন ও আইন-অমান্য সঙ্কল্প করেন এবং তার নেতৃত্বের ভার দেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাংলার জেলগুলোতে পূর্ণ হয়ে গেল এবং সরকার দমদম ও খিদিরপুরে স্পেশাল জেল তৈরী করতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বলেছিলেন "অনেকে মনে যে তার (দেশবন্ধুর) স্বদেশ সেবা ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাত্রীকার চরণে নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তার উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তার পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরনে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ধরপাকড়ের সময় তিনি স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে একে একে তার পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। আমরা জানতুম যে তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন; তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেফতারের পূর্বে তার পুত্রের যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোন মহিলাকে যেতে দিব না। শেষে তিনি বললেন। এটা তার আদেশ। পালন করতে হবে। তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা যে আদর্শ শিরোধার্য করলুম"[৪]। এই বয়কট আন্দোলন করার সময় বড়বাজারে খদ্দর ফেরী করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন বাসন্তী দেবী ও সুনীতি দেবী। ১০ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ প্রমুখও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী হন।

১৯২২ খ্রিঃ জুন মাসে দেশবন্ধু কারামুক্ত হলে শ্রদ্ধানন্দশপার্কে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবং এই সভার যে অভিনন্দন পত্রটি পড়া হয় সেটিও রচনা করেছিলেন লেখক। দেশবন্ধুর প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা কতখানি প্রগাঢ় ছিল এই অভিনন্দন পত্রটি ছিল তার নিদর্শন "একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল। সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ-দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুন সম্বন্ধ আজও তেমনি গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাকে। কিন্তু তারা একদিন এই বাংলাদেশে তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল। সেদিনও সে ভুল করে নাই। কিন্তু সে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ, দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুন সম্বন্ধ আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু তারা একদিন এই বাংলাদেশে তোমাকে ভাবুক বলিয়া কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিন ও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাংলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উত্থাটিত করিয়া দেখিতে; তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে; তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। ... তাহার পর একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার উপলব্ধি পৌছিল। সেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্বপনে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই। বীর তুমি দাতা তুমি কবি তুমি, ... তোমাকে ভয় নাই; তোমার মোহ নাই-তুমি নিলোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজ্য তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না। সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই ডেসেড় শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন। তোমাকেই সর্ব্বলোলে চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রাণ করিয়া দিতে হইল। সে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল।...

হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয় তোমার সকল গর্ব্বের গর্ব্ব-বাঙ্গালী তুমি; তাই-ত সমস্ত বাংলার হৃদয় তোমার কাছে বহিয়া আনিয়াছে- আর আনিয়াছে বহুজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ, তুমি চিরজীবি হও। তুমি জয়যুক্ত হও"[৫] এই ভাবে শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তর দিয়ে দেশের নেতার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন প্রকাশ করেছিলেন তিনি চিত্তরঞ্জনকে মনে প্রাণে ভালোবাসিতেন শ্রদ্ধা করতেন তার বাঁধানো পথেই তিনি স্বাধীনতার মন্ত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন জেল থেকে মুক্তির পূর্বে শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন পরমর্শদাতা কিন্তু ক্রমান্বয়ে তিনি সক্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন এই সময় আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে একটি দল এই সময় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু বন্দীদের ছাড়া পাওয়া বা পিকেটিংএর বিষয়ে তেমন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ১৯২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর যুবরাজ কলকাতায় এলে। কলকাতা মহানগরী শ্মশানের মতো নীরবতার আবরণে নিজেকে ঢেকে ফেলেছিল। দেশবন্ধু এই সময় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শরৎচন্দ্র তার মামা উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে খালি পায়ে হাওড়া পুলের কাছে অগণিত জনতার ভিড় সামলাতে ব্যস্ত থাকেন। ধর্মঘট বেশ সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হয় যা দেখে ইউরোপীয়রা প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সরকারের দমন নীতিও আরো তীব্ররূপ ধারণ করে। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনেও সেই সময় আরো তীব্রতার আকার ধারণ করে। এই আবহাওয়ার মধ্যেই আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। দেশবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হন, তবে তিনি তখন জেলে, সেই জন্য হাকিম আজমল খাঁকে কার্যনির্বাহক সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হয়। দেশবন্ধুর লিখিত ভাষন সরোজিনী নাইডু পড়েন তাঁতে দেশবন্ধু ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের কথা ব্যাখ্যা করেন- "আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরিপূর্ণরূপে প্রহণ করার পূর্বে আপন সভ্যতা ও নিজেকে জেনে নেওয়া উচিত"[৬]।

অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা ভারতবর্ষে এক বিরাট আকার ধারণ করেছে তখনই দেশের বিভিন্ন জায়গায় অহিংসা আন্দোলনের বীজ বপন হতে শুরু করে এবং একটি বিশেষ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯২২ সালে গোরখপুর জেলার চৌরিচোরা গ্রামে কংগ্রেসের একটি মিছিল বের হয় এবং সেই সময় হঠৎই দাঙ্গা বেধে যায় এই দাঙ্গার ফলে বারদৌলী হল্টএ একুশজন সেপাই ও একজন দারোগাকে থানায় বন্ধ করে, জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। যা চৌরিচোরার ঘটনা নামে খ্যাত। এই সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজেও বেশ কিছু অহিংস আন্দোলনের খোঁজ পাওয়া যায়। গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের হিংসাত্মক পরিণতিতে খুবই বিচলিত হয়ে যান এবং আন্দোলনটিকে ওখানেই বন্ধ করে দেন। অবশ্য জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বরা তার এই সিদ্ধান্তে যথেষ্ট হতাশাগ্রস্থ হন। এরপরেই সরকার গান্ধিজিকে গ্রেফতার করে এবং রাজদ্রোহীতার অপররাধে ছয় মাসের জন্য গান্ধিজি গ্রেফতার হন। যিনি সারা ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন সেই আগুন এক নিমেষেই যেন নিভে গেল। শরৎচন্দ্র এতে খুবই ব্যথীত হন।

১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাতে দেশবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র সেই সময় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন কিন্তু অসুস্থতার দরুণ তিনি ঐ অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি। তবুও তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাবটির পূর্ণ সমর্থন করেন এবং বলেন " অসহযোগ আন্দোলনকে হঠাৎ স্থগিত করে রাখার জন্য যে ঘোর নিরাশার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে নিস্কৃতি পাবার এটাই একমাত্র উপায়"[৭]।

গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষনে দেশবন্ধু স্পষ্টভাবেই পরিষদে প্রবেশের কথাটি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তার প্রস্তাব পাশ হয় না। দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎ সভাপতির পদ ত্যাগ করেন, ১লা জানুয়ারি ১৯২৩ খ্রিঃ কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করেন, এই দলে সভাপতি হন চিত্তরঞ্জন দাশ। সহ সভাপতি মতিলাল নেহেরু। সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কার্যকারী সমিতিতে নানা প্রদেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন। কলকাতার স্বরাজ্য দলে

সর্বপ্রথম নাম লেখান সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায়, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুকুমার রঞ্জন দাশ, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অবশ্য পরে হৈমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সাতকড়ি রায়, মনোমোহন নিয়োগী, বসন্তকুমার মজুমদার ও হেমপ্রভা মজুমদারও এই স্বরাজ্য দলে যোগ দান করেন।

এরপর দেশবন্ধু পর্যবেক্ষণের জন্য সারা দেশ ঘুরে বেড়ান এবং অবশেষে দেশবন্ধুর কর্মধারাকে দেশবাসী গ্রহণ করেন, এরপর ১৯২৩ সালের ২৫-২৭ শে মে বোম্বাইতে কর্ম সমিতি ও মহাসমিতির বৈঠক হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে দেশবুন্ধু মহাসমিতির সভাপতি নির্ধারিত হন। এই সভায় শ্রী পুরুষোত্তম দাস টন্ডন দ্বারা প্রস্তাবিত এবং জহর লাল নেহেরু দ্বারা আনুমোদিত একাটি প্রস্তাব সমিতি দ্বারা পাস হয়। তাতে বলা হয় কংগ্রেসের সব সদস্যদের আপন আপন মতভেদ ভুলে গিয়ে এক হয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী স্বীকৃত প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন রকমের প্রচার কার্য করা যাবে না।

দেশের স্বাধীনতা শরৎচন্দ্র আন্তরিক ভাবে কামনা করতেন। তাই তিনি মনপ্রাণ দিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তি যুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের অন্তরে যে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, বোম্বাই সমিতির সদস্যদেরও দেশবন্ধু ক্রমান্বয়ে নিজের মতের স্বপক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দিলিপ কুমার রায় এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও এই সভায় যোগদান করেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে শেষবারের মত বোঝাপড়া হয় এবং আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবার এবং নিজের মত ও অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা সবাইকে দেওয়া হয়।এই অধিবেশনে কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে সব রকমের কার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরই বেঙ্গল কাউন্সিলের নির্বাচন হন। দেশবন্ধু চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র হাওড়া থেকে পদপার্থী হন। কিন্তু শরৎচন্দ্র -এর প্রবল বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্র বলেন "দেশের জন্য আমি কি করেছি? জেলেও যায়নি ওকালতি ব্যারিস্টারি ছাড়িনি। কোন রকমের ত্যাগ স্বীকার করিনি; দেশচ্যুত হইনি। হওয়ার শাস্তিও আমি ভোগ করিনি। আপনি আমায় ভালোবাসেন, এ আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি নিজেও একজন কবি ও সাহিত্যিক। সাহিত্যিক হিসাবেই আপনি আমার ভালোবাসেন। বন্ধুত্বের খাতিরে আমি আপনার প্রিয়জন হতে পারি, কিন্তু দেশের জনতা তারা কেন আমায় ভালোবাসবে, কেন সম্মান দেবে? আমি আমার সাধনাকে রাজনীতির মূলধন করতে চাই না"। এই ভাবে শরৎচন্দ্র কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন সাহিত্যিক তাই রাজনৈতিক কোন পদ গ্রহণ করার অভীপ্সা কোন দিনই তার মনে ছিল না। তাই তিনি ঐ পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন, এরপর কলকাতা পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশবন্ধু জয়যুক্ত হন। তিনিই হন কলকাতার প্রথম মেয়র। শরৎচন্দ্র সবসময় দেশবন্ধুর সঙ্গে ছায়াসঙ্গীর মতো ঘুরে বেড়াতেন, ও নানা সাংগাঠনিক কাজকর্মে নিস্বার্থ সাহায্য করতেন। ১৯২৫ সালে ২৫ জুন দেশবন্ধুর দেহান্ত হয়।

সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে কংগ্রেসের সংগঠনিক কাজে বিশেষভাবে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্রের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র নানা সভায় সভাপতি আসন গ্রহণ করতেন। তবে সেই সময় কংগ্রেসের সংগঠন মূলতঃ দুটি খাতে বইতে থাকায় শরৎচন্দ্র যেমন বিভিন্ন সভায় অভিনন্দন গ্রহন করেছিলেন তেমনি অপমানও কম জোটেনি। যেমন ১৯৩১ খ্রিঃ মে মাসে কুমিল্লায় জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি এই সময় বাংলা কংগ্রেসে সুভাষপন্থী ও যতীন্দ্র মোহন পন্থীতে বিভক্ত। সুভাষপন্থী শরৎচন্দ্রের ছাত্র সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিপক্ষ দলের অপছন্দের ছিল। যার জন্য ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় কি প্রকার লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল তা জানতে পারা যায়।"দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিলেন। পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়িরে জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুড়ো মহমাথা গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলেন"। অবশ্য ১৯৩১ সালে ৭ই ও ৮ই মে কুমিল্লাতে পরবর্তী সভায় পৌঁছানোর আগেই প্রায় কুড়ি

হাজার মানুষ তাদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। অবশ্য এই জনসভায় সর্বশ্রেণির মুসলমাগণও উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩১ খ্রিঃ ১৮ জুন হাওড়ায় জেলা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই নির্বাচনেও সুভাষপন্থী ও যতীন্দ্রমোহন পন্থীদের মধ্যে বেশ লড়াই লক্ষ করা যায়। অবশ্য শেষে সুভাষ বসুর সহযোগী তথা শরৎচন্দ্রই জয়ী হন। এই নির্বাচনের ছায়া রাজনৈতিক কর্মপরিধিকে অতিক্রম করে সাহিত্যিক মহলেও যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। শরৎচন্দ্রের ৮৭ তম জন্মোৎসব সভা ভণ্ডুল করতে যতীন্দ্রমোহন পন্থীরা সার্থক হয়েছিল। ঐ দিনই তারা হিজলী জেলে মৃত দুজন রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদিবস পালনের আয়োজন করে। যার ফলে শরৎ জন্মবার্ষিকী বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি এটিকে সাহিত্যকদের উপর রাজনৈতিক আক্রমন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কারণ এই ধরনের অপমানের স্বীকার রবীন্দ্রনাথকেও হতে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলেও বিপ্লব পন্থার প্রতি তার মন অনেকদিনই বিচলিত হয়েছিল। গান্ধিজি যখন কংগ্রেসী আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বারবার দুর্বল হয়ে পড়ছেন। সেই সময় থেকেই গান্ধিবাদী চিন্তাধারা থেকে নিজের মনকে সরিয়ে এনে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসার ফলে শরৎচন্দ্রও বহু বিপ্লবী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মামা বিপিন বিহারী ছিলেন একজন বিপ্লবী তাছাড়া বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তিনি বহু সময় বিপ্লবী কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতেন। বাজেশিবপুরে বা সামতাবেড়ের বাড়িতে থাকাকালীন হেমচন্দ্র ঘোষ বহুবার তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। লেখক বহুবার তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিন এমনকি শরৎচন্দ্র তার নিজের রিভলবারটিকে এই সকল বিপ্লবীদের দিতে চাইলে তারা বলেছেন রিভলবারের থেকেও তাদের বেশি প্রয়োজন হল গুলির। লেখক তাদের গুলিরও ব্যবস্থার করে দিয়েছিলেন। অবশ্য গুলি বা অর্থ এই দুটিই ছিল তাদের বৈপ্লবিক কারকর্মের অন্যতম হাতিয়ার কিন্তু এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল তাদের নৈতিক সমর্থন। গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তারা ছিলেন ধিক্কার ও অবজ্ঞতার পাত্র। সমাজের চোখে তারা সমাজবিরোধী একগোষ্ঠী বলে পরিচিত। অবশ্য তারা রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমূল সমর্থন পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে। হেমচন্দ্র লিখেছিলেন -"ভারতবর্ষের বিপ্লবপন্থার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য তার প্রেম ভালোবাসা , অহেতুক করুণা এবং তাদের জন্য গভীর বেদনাবোধ ও দরদ - যেন আর সীমা ছিল না ? -এই সব দুঃসাহসী। ভয় ভাবনাহীন , মৃত্যু পাগল, দুঃখ তপস্যা ব্রতধারী মানুষগুলি তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। তিনি তাদের সঙ্গে সত্যকার এক বিশেষ ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করতেন অন্তরে। বিপ্লবীদের প্রতি তার মাতৃসুলভ মমতা ও ভালোবাসার জন্য শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের এত প্রিয়শ, এত পূজানীয়া ছিলেন। .....আজীবন তিনি এই অজ্ঞাত অবহেলিত লক্ষ্মীছাড়া তরুন সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন"।

তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের আপনজন। তিনি কংগ্রেসী রাজনৈতিক কর্মী সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবনচালনা করলেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীপন্থাকেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি বুঝেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শোষন থেকে দেশকে মুক্তি করতে কেবলমাত্র কংগ্রেসের নরমপন্থী বা চরমপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই সীমিত রাখলে চলবে না। তার জন্যে চাই সামগ্রীক অভ্যুত্থান। সন্ত্রাসবাদী এই গোষ্ঠীগুলিকে লেখক তাই মনে প্রাণে সমর্থন করতেন। ১৯২৪ সালে রেগুলেশন আইন ও বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনে ধৃত রাজবন্দীরা মুক্তি পান। মুক্তির পর অধিকাংশ রাজবন্দি আত্মীয়স্বজনের কাছে অপাংতেয়, পুলিশ ও গুপ্তচরের শাণিতদৃষ্টিতে বিব্রত এবং কংগ্রেসের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে উঠলে শরৎচন্দ্র ঐ সকল বিপ্লবীদের সম্বধর্না জানানোর উদ্দেশে একটা সভা অনুষ্ঠিত করেন। এই সভায় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন "দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে,যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্নমেন্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্নমেন্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে, এদের মনের অপরাধের বল আর অন্তরের অনির্বান স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরচঞ্চল চিরজীবি এরা"।

শরৎচন্দ্র এই সময় রাজনীতিতে আকুণ্ঠ ডুবে যান। সাহিত্য ও সংসার এই দুটির প্রতি তার তেমন উৎসাহ ছিল না। অবশ্য রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী সংগঠন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প রচনা করেন। শরৎ গ্রন্থাবলীর পঞ্চম খণ্ড ছাড়াও 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ও 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটি এই সময় প্রকাশিত হয়। শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব, 'পথের দাবী', 'নব বিধান' ও 'জাগরণ' এই চারটি উপন্যাসও তিনি এই সময় লেখা শুরু করেন। 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পদুটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও সেই সময় প্রকাশিত হয়। এই সকল গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধর মধ্যে একদিকে যেমন সামাজিক কলুসতাময় সমাজ জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রচিত হয়েছে আবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ইতিহাস ও বক্তব্যেরও একটি নির্দিষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক রচনা গুলি হল একধারে তৎকালীন বৈপ্লবীক কর্মকাণ্ডের একটা ইতিহাস অপরদিকে লেখক কোন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তারও একটা বর্ণনা পাঠক সমাজ অনুভব করতে পারে। এবিষয়ে শরৎচন্দ্র বসুর বক্তব্য বিশেষ স্মরণীয় "যার সকলের অবজ্ঞায় লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্ধকারে, চোরাগলিতে যাদের আনাগোনা তাদের কথাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তিনি বুঝেছিলেন আজকের সমাজ যাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না। যাদের মধ্যে সাধারণ চক্ষু গ্লানি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। তারাই হল সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড। তাদের প্রাণশক্তিতেই আজও সমাজ বেঁচে আছে। কিন্তু এই বিরাট অসংগতি এই অর্থহীন অসামঞ্জস্য নিয়ে সমাজ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না-তাও এই সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকেনি। তাই তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখেছি ভাবী বিপ্লবের ইঙ্গিত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি নিয়ে এই বিপ্লবকে তিনি উপলব্ধি করেনি। কেবল মাত্র বৈদেশিক শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তার অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে যে অন্যায়, যে অত্যাচার তাঁর লক্ষ্য পথে এসেছে তার বিরুদ্ধেই তাঁর লেখনী তীব্রতম ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সর্বরকম অন্যায় পাপ, অত্যাচারের সমাধির উপর তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন স্বাধীন, সুস্থ, সুন্দরতম সমাজব্যবস্থা, শোষিত জনতাকে অন্ধকার নির্বাসন থেকে তিনি আনতে চেয়েছেন আলোকোজ্জ্বল উন্মুক্ত সরণিতে"। ১৩২৭-১৩২৮ সালে 'ভারতবর্ষে' পত্রিকায় শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব উপন্যাসটি আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭ সালে তা পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির পটভূমি বীরভূমির একটি গ্রাম গঙ্গামাটি। এই গ্রামটির বর্ণনায় তিনি বলেছেন " দেশে জল নাই , প্রাণ নাই , স্বাস্থ্য নাই - জঙ্গলের আবর্জনায় যেথায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ। যেখানে জ্ঞান নাই , বিদ্যা নাই ধর্ম যেথায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল্প , জন্মভূমির এই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরে পড়িযাছি। নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না থাকা যে কত বড় না থাকা , মনে হইল আজি কার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না'। এই দুর্দুশাগ্রস্থ গ্রাম্য অবস্থা বর্ণনার দ্বারা লেখক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার নগ্নরূপ পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

লেখকের এই কাহিনির পিছিনে তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা কেই দায়ী করেছিলেন। এই যুগে জমিদার দ্বারা এই সোনার বাংলা দেশকে রিক্ত করে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে শ্রীকান্ত যখন সন্ন্যাসী ব্রজনন্দের সঙ্গে গঙ্গামাটিতে যাত্রা করেন এই বক্তব্যের মধ্য দিয়া "কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাতে দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল। কেমন করিয়া মাতৃভুমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশিরা শোষণ করিয়া লইল। চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাসের ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল"
এই নির্মম শোষণের ফলে দেশের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারও দেশজুড়ে একটি আলাদা মাত্রা ধারণ করেছিল।

ভারতবর্ষের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল একচেটিয়া বাণিজ্যের দ্বারা মুনাফা অর্জন করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সুযোগে বিদেশী বুর্জোয়ারা নতুন নতুন এলাকা দখল করে নেয় এবং অপরদিকে ভারতবর্ষে যাতে অনিকগোষ্ঠী গজিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তার সম্ভাবনাও নষ্ট করে দিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটিশ জাত পণ্যে বিক্রয়ের জন্য

নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করা। বিনিময়ে তারা এদেশ থেকে নিয়ে যেত রূপা, সোনা, বিদেশী মুদ্রা, তারা জোর করে এদেশের কৃষকদের ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জিনিষপত্র কেড়ে নিত। প্রকৃতপক্ষে তাদের মূল কাজ ছিল লুটের কারবার করা। এই লুণ্ঠনের ফলে বাংলাদেশের অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

পলাশীর যুদ্ধের পরে বাংলাদেশের লুণ্ঠিত সম্পদে ইংল্যান্ড সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠলে সেখানে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। অবশ্য এই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অবাধ বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তৎকালীন শিল্পপতিরা তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য খর্ব করতে সচেষ্ট হন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা প্রবর্তিত করলে ব্যাক্তিগত খেয়াল খুশি মত খাজানাবৃদ্ধি প্রবণতা বন্ধ হলেও ভূঁইফোর জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। কর্ণওয়ালিশের জমিসংস্কার পদ্ধতি তৎকালীন যুগে সংস্কার হিসাবে দেখা দিলেও তা ছিল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহৃত ভারতের উপর ব্যাপক শোষণ পদ্ধতি। ১৮১৩ খ্রিঃ পূর্বে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর লুণ্ঠন সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ছিল একটি রপ্তানীকারন দেশ কিন্তু এর পর থেকেই ভারতবর্ষ একটি আমদানী কারক দেশ হিসাবে বিবেচ্য হয়।

ইংল্যান্ডে যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত জিনিস ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেললে যার পরিণতি স্বরূপ ভারতবর্ষের শিল্প বাজার ধ্বংস হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ভারতীয় বাজারের উন্নতিকল্পে এবং কাঁচামাল রপ্তানীর জন্য এদেশে রেল লাইন পাতা হল। টেলিগ্রাফের তার বসানো হল, নতুন বাগিচা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে ভারতের দুর্গতি আরো বাড়তে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে প্রায় ২৪ বার দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এর ফলে ভারতে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হলে ভারতবর্ষে শিল্পায়ন নীতি প্রবর্তিত হয়। ১৯০৫ খ্রিঃ লর্ড কার্জন শিল্প ও বাণিজ্যের নামে একটি নতুন বিভাগ চালু করল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে নানা শিল্প গড়ে ওঠে। যার ফলে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই ভাবে শিল্পগত মূলধনের জায়গায় অর্থপুঁজি ভারতের প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। এইভাবেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষন কায়েম করতে লাগল। শ্রীকান্ত তৃতীয়পর্বে ইংরেজ আগমনের পর সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়ে যাওয়ার পিছনে এই ইতিহাসই লেখক দায়ী করেছেন। গ্রামের মানুষের কাছে ইংরাজদের রাজত্বের পিছনে খাঁটি পলিটিক্স অপরিজ্ঞাত ছিল না। সেই জন্য শ্রীকান্ত তার গ্রাম্য পথার সঙ্গী বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলেছিলে " কোম্পানী বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এদের ছোঁয়াচের গুণ"। বাংলাদেশে ইংরাজ সরকার যখন রাজত্ব করতে আসে তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিজ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এবং তার জন্য যে সকল কাজ করণীয় সেগুলিই তারা মুলত করেছিল। দেশের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তুলনা করা তাদের জীবনে খুব একটা প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে বিবেচিত হত না। সেই কথাই যেন শ্রীকান্ত উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। "কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেল লাইন পাতবার? কোন লোকে কি তা চায় ? চায় না। কিন্তু তবু চাই। দীঘি নেই, পুকুর নেই,কুঁয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু বাছুরগুলো জলাভাবে ধড় ধড় করে মরে যায় কোথাও একটু ভালো জল থাকলে কি সতিশ মারা যেতেন? কখখনো না। ম্যালেরিয়া , কলেরা হরেক রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে" আসল কথা হল যে সেই সময় " বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলদের সুখ গেল, শান্তি গেল ,অন্ন গেল, ধর্ম গেল- তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সংকীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিসহ হইয়া উঠিতেছে"[১৭]। আমাদের দেশে " এই রেল, এই কল, এই লোহা বাঁধানো রাস্তা - এই তো হল পবিত্র vested interest এই গুরুভারেই তো সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই"[১৮]। সমকালীন ইংরেজ সরকারের বাণিজ্যনীতির ফলস্বরূপ আমাদের দেশে রেল, ডাক, ও যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও তা ছিল মূলত তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার একটি প্রয়াস এই শিল্পের উন্নয়ন ভারতবাসীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু

করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে কার্লমার্কস বলেছিলেন " I know that the English millocracy intend to endow India with railways with the exclusive view of extracting at siminished expenses to cotton and other raw matarials for their manufactures"

শ্রীকান্ত উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে লেখক গ্রাম্য জীবনের শোষন ও দারিদ্র্যের একটা করুণ চিত্র পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলন। শ্রীকান্ত নিজে গ্রাম্য জীবনের করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবশ্য লেখক বার বার দেশের এই দুরাবস্থার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণকেই দায়ী করেছিলেন। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশকে তারা দুর্ভিক্ষ মহামারি দেশে পরিণত করেছিল। তাদের আচরণের মধ্যে কেবলমাত্র ছিল হিংস্রতা। শ্রীকান্ত মুমূর্ষ সতীশ ভরদ্বাজকে দেখতে এসে, রেললাইন পাতার জন্য মাটি কাটা কুলিদের সঙ্গে বাস করে ইংরেজ শোষণের প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে। এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল"। মানুষকে শোষণের যাঁতাকলে অমানুষ করে, পশু বানিয়ে তুলতে পারলেই তাদের দিয়ে সব কাজ করানো সম্ভব বলে ধনিক শ্রেণি বুঝতে পেরেছিল। লেখক সেই কথাই যেন তার প্রতিটি গল্পে বলেছিলেন।

লেখক কেবল ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, একই সঙ্গে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্রজনন্দের মত একজন চরিত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রজনন্দ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ডাক্তারী পাশ করেছিলও তবুও সে দরিদ্র মানুষের সেবা ও দেশসেবার মধ্য দিয়ে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ, পাঠশালা তৈরি করেছে। গ্রামের মানুষকে তাদের দুরাবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। দেশের ও মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই সে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। এই ব্রজনন্দ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে যেমন সচেতন করে তুলেছিল তেমনি তিনি বুঝেছিলেন দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ছাড়া এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। লেখক তাই ব্রজনন্দের নেতৃত্বে একটা আদর্শ সংগঠন গড়ে তুলে দেশও সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার দাবি করেছিলেন।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অপর একটি সমাজ সচেতন উপন্যাস। এই উপন্যাসে দেখা যায় হরেন্দ্র লেখাপড়া শেষ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে সাধু সঙ্গ করেছে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সমিতিতেও যোগদান করেছে। এমনকি বন্যা পীড়িতদের ত্রাণকাজেও সাহায্য করেছে। তার অপর এক বন্ধু অবিনাশের আহ্বানে সে আগ্রায় গিয়ে সেখানকার কলেজে শিক্ষকতা করতে শুরু করে। কিন্তু দেশসেবার কাজকে হরেন্দ্র অস্বীকার করতে পারেনি তাই আরেক বন্ধু সতীশকে নিয়ে সে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে গড়ে তোলেন। সতীশের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিদেশী শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতার কথা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। "যে একদিন বিদেশের দর্শন বিদেশের সভাতার প্রভাবে সত্য ভ্রষ্ট, আদর্শ ভ্রষ্ট, জন কয়েক ব্যক্তি অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, বিজাতীয় স্পর্ধায় স্বদেশের যা কিছু আপন তাকে তুষ্ট করে দিয়ে দেশের মানুষের মনকে বিক্ষিপ্ত কদাচারী করে তুলেছিল এবং কিছু কিছু শিক্ষিত নব্য বাঙালি খ্রিস্টান হতে শুরু করে। কিন্তু শীঘ্রই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।"

কিছু শিক্ষিত মানুষ জাতির এই দুর্দিনে, মানুষের খ্রিস্টান হওয়া থেকে রদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই হরেন্দ্র সতীশের মতে জাতি গঠনের উপাদান ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য ও সংযমকে কেন্দ্র করে ভারতীয় আশ্রম ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। তার মতে বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন মোচন করতে হলে ধর্মের সাধনা ত্যাগের দীক্ষার প্রয়োজন। দেশের ধর্ম, পুরান ইতিহাস, আচার ব্যবহার যা সমস্তই বিদেশী শক্তির চাপে পড়ে ক্রমাগতই লোপ পেতে চলছে তার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ভাবে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের লেখক জাতীয় চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার ও ধর্মসংস্কার মূলক আন্দোলনের প্রসারের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই উপন্যাসে কলম, হরেন্দ্র ও সতীশের ব্রহ্মচর্য মতাদর্শের বিরোধিতা করেছেন, কমলের মতে, মানুষের কল্যাণ অনেক বড় একটা কাজ। তাই তার জীবনে তত্ত্বের মহিমাকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রাচীন রীতি, নীতি,

আচার অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে স্বদেশিকতা জাগাতে হবে এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা কলম করেছেন। তার মতে সমাজ ও মানব কল্যানের প্রয়োজনে পুরাতন ধারণাকে বর্জন করে নতুন বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাধারাকে স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে ধর্ম সংস্কার মূলত আলোচনা ও দেশ সেবার মুলত আত্মাত্যাগের মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তার ব্যবধানকে অস্বীকার করে এক উন্নত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের কথা লেখক তার উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রচার করেছেন।

অমসাপ্ত 'জাগরণ' উপন্যাসটি মহাত্মাগান্ধির আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। 'রে' সাহেবের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র যেন তার নিজের বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন। "গান্ধিজির অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মীরা দেশের মানুষের ডেকে বলেছে কেহ তোমরা মারামারি কাটাকাটি করো না। কোন ব্যক্তি বিশেষ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, কিন্তু এই অনাচারী ধর্মহীন সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না, চাকুরীর লোভে তার দ্বারে যেও না, বিদ্যার জন্য এ স্কুল কলেজ ঢুকোনা, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্যন্ত মাড়িও না।"[২১]

অসহযোগ আন্দোলনের বেশ কিছুর কার্যাবলী ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা, পিকেটিং করা ইত্যাদি। এই আন্দোলনের প্রভাবে কেবলমাত্র শহরাঞ্চলেই নয় সুদূর গ্রামেও এর প্রভাব দেখা যায়। সত্যাগ্রহীরা অমরপুরের হাটে বিলিতি বস্ত্র বিক্রী, জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রে সাহেবের জমিদারীর ম্যানেজার নিরুপায় হয়ে সকল ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানায়, সত্যাগ্রহীদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী প্রজারা ধর্মঘট করে খাজনা বন্ধ করে দেয়। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলে, রে সাহেব তার কন্যাকে নিয়ে জমিদারিতে আসেন। গ্রামের অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ছিলেন অমর নাথ। রে সাহেবের কন্যা আলেখ্য তাদের গ্রামের বাড়িতে এসে বিদেশী আসবাবপত্রে, বিদেশি বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য দিয়ে তাদের গ্রামের বাড়িটি সাজাতে চায়। কিন্তু তাতে বাধ সাধে অমরনাথ এবং সে রে সাহেবের কন্যাকে তাদের গ্রামের প্রজাদের রক্তজল করা কষ্টের পয়সার অপচয় করতে বারণ করেন। এইভাবে অমরনাথ ও অলেখ্যের সংঘাতের মধ্য দিয়ে জাগরণের কাহিনির ক্রমান্বতি ঘটে। অমরনাথ হাটে গিয়ে বিদেশী কাপড় বিক্রী বন্ধ করার জন্য পিকেটিং করলে তাকে বিক্রেতাদের দ্বারা আহত হতে হয়। এই সময় আলেখ্য জমিদারের কর্তব্যস্বরূপ অমর নাথের গায়ে যারা হাত দিয়েছে, তাদের শাস্তির জন্য নাম জানতে চাইলে, অমরনাথ তাদের গ্রামের লোকের নাম বলতে অস্বীকার করে। তাছাড়া অমরনাথ ছিল গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য এক সমর্পিত প্রাণ। তাই একদিকে যেমন গ্রামের মানুষের সেবা করা তার পরম ধর্ম তেমনি দেশমাত্রিকার মুক্তির জন্য যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিত হচ্ছে সেই আন্দোলনে এগিয়ে গিয়ে দেশ নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও সে সদা প্রস্তুত। অমরনাথের মত দেশ প্রেমিকের বিরুদ্ধে, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ বানানোর চক্রান্ত মূলক অভিযোগ উঠে আসে। দেশের সেবা ও তার সঙ্গে গ্রামের উন্নতি করা কোনটাই খুব একটা সোজা বা সরল কাজ নয়, সেই কাজে আত্মনিয়োগ করা যেমন কঠিন, তেমনি সেই কর্মকাণ্ডে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সত্যই একটা চ্যালেঞ্জ। এই পথে অনেক বাধা বিপত্তি থাকে সেটি দেশের মানুষদের কাছ থেকে যেমন সত্য তেমনি বিদেশী সাহেবদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। সেই কণ্ঠকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে নিজ দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তৎকালীন যুবক সমাজের মূল লক্ষ্য। এই ভাবে অসমাপ্ত 'জাগরণ' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলন এবং তার গতিপ্রকৃতির নানা বর্ণনা ফুটে উঠেছে। তিনি নিজে ছিলেন এই আন্দোলনের একজন পথ প্রদর্শক ফলে তার পক্ষে সেই সময়কার খুটিনাটি ঘটনা জানা যেমন সহজ ছিল তেমনি আন্দোলনের নানা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছিল এই উপন্যাসে ফলে তা যথার্থই একটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে আজও পাঠকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ১৩৩০-৩২ বসুমিত পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হলেও লেখক গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আস্থা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলায় উপন্যাসটি অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু এই উপন্যাসটি রচনা শেষ করতে পারলে এটিও লেখকের অন্যতম বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে খ্যাত হত।

শরৎচন্দ্রের অপর একটি অসমাপ্ত উপন্যাসও তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এককড়ি। স্বদেশী আন্দোলনে এতটাই আত্মনিয়োগ করেন যে, শেষ পর্যন্ত তাকে জেলেও যেতে হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দলীয় রাজনীতি এতটাই ভয়ানক হয়ে ওঠে এককড়ির মত মানুষের প্রত্যক্ষ রাজনীতির জীবন থেকে সরে এসে নিজের লাইব্রেরীর ঘরে আশ্রয় নেয়। এককড়ি যতদিন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ, যুক্ত ছিলেন ,তখন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় তাকে বিভিন্ন বিশেষনে বিভূষিত করা হত, কিন্তু যখনই সে রাজনীতির কলুসতাময় জীবন থেকে সরে গেলেন, তখন ঐ সমস্ত জনগণ তাকে চোর বদনাম দিতেও দ্বিধাবোধ করল না। এককড়ি রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধা কিছু ছেলে মেয়েকে নিয়ে দেশের সেবার জন্য নতুন পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। তিনি দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য গ্রামে, নগরে, পল্লীতে সর্বত্র সমাজ কল্যাণের কর্মসূচী চালু করেন এবং দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্য কল্যাণ সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত করেন। এই কাহিনিতে এই সংগঠনেরই কেরানী হল মনিমালা। সেও এই সময় অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত ছিল। এই মনিমালা নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে ‘নারীসমিতিতে’ সেই দাবিগুলিকে উত্থাপিত করে। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রতি আশাহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া রাজনীতির কর্মকাণ্ডে তখনকার গবেষকদের মতে শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে দলাদলি ঘটেছিল তার প্রকৃত রূপের পরিচয় যেন এই উপন্যাসখানি। অনেক গবেষকদের মতে শরৎচন্দ্র এই সময় নিরুৎসাহী রাজনৈতিক কর্মীদের সেবামূলক কাজে কর্মদৃপ্ত রাখার জন্য ‘আগামীকাল’ উপন্যাসটি রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন।

‘বিপ্রদাস’ উপন্যাসটিতে বলরামপুরের চাষী ও রেললাইনের কুলিদের এক জন সভার বর্ণনা দিয়ে সূত্রপাত ঘটে। এই সভার কলকাতার নাম করা বক্তারা অংশ নেন সেই সময়কার অসাম্য ও অমৈত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। বক্তৃতা শেষে এই জন সভার একটি মিছিল ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি সহযোগে গ্রাম পরিক্রমায় বেড়ায়। কৃষকদের মৈত্রীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত এই মিছিল যখন জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যায় তখন বিপ্রদাস মনে মনে সেই মিছিলের শ্লোগান দিতে থাকে। বিপ্রদাসের ভ্রাতা দ্বিজদাস স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ মিছিলেও অংশগ্রহণ করেন। গ্রামে বিপ্রদাসের প্রতিপত্তি ছিল এবং সে জনগণের সেবায় মধ্য দিয়ে দেশসেবায় নিজ জীবনেকে বলিদান করে ছিলেন। আসলে বিপ্রদাস রক্ষণশীল পরিবারে রড় হয়ে উঠেছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতাও গ্রামের মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে বিপ্রদাসের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আসলে লেখক তার উপন্যাসগুলিতে নানা ধরনের মানুষের জীবনকাহিনি রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি কোথাও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী মানুষের কথাও যেমন দেখিয়ে ছিলেন তেমনি প্রথাগত রীতিনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ বেশ কিছু মানুষ যারা দেশ সেবার কাজে উৎসাহিত হলেও নিজ জীবনের কিছু রক্ষণশীলতার জন্য এই আন্দোলনের সামিল হতে পারেনি। উপন্যাসটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও শরৎচন্দ্র এই কাহিনিগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন দেশসেবার কাজে মানুষের চিন্তাধারাও নানা রূপের কথা পাঠক সামনে তুলে ধরেছিলেন .

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়াও শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’, ‘হরিলক্ষ্মী, এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’ কাহিনিগুলির মধ্যে শোষন ও অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ‘মহেশ’ গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক গ্রামবাংলার দুর্বিসহ দুঃখের কাহিনি জমিদারের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। এখানে গফুর বলে একজন দরিদ্র জোলার পরিচয় পাওয়া যায়। জমিদারের শাসন ও শোষনের ফলে গফুরের অবস্থা খুবই শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল। তার সঙ্গে ছিল মুসলমান হওয়ার জন্য অস্পৃশ্যতাজনিত জাতপাত গত সমস্যা। যার ফলে জীবন ধারণের জন্য পানিয় জলটুকু সংগ্রহ করতে তার ছোট মেয়েকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকতে হোত। এই গফুর মিয়ার ছিল একটি পোষ্য গরু, তার নাম ছিল মহেশ। তাকে সে তার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবেই জ্ঞান করত ও ভালোবাসত। তাই চরম দারিদ্রের মধ্যেও মহেশের খাদ্যের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু তৎকালীন গ্রামগুলিতে ছিল জমিদারের

নির্মম শোষন ও অত্যাচার। জমিদারের হুকুম অমান্য করলে প্রজাদের জুটত চরম নির্যাতন। গফুরকেও জমিদারের পেয়াদারা ধরতে আসলে গফুর বলেছিল "মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি। আমি যাবো না।" কিন্তু তার ফল স্বরূপ জমিদারের অত্যাচারে "তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠেছিল"[২৩]। এর পর সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে নিজের হাতেই মহেশের প্রাণ নেন এবং মেয়ে অনিমা কে নিয়ে ফুলবেড়িয়া চটকলে অর্থের আশায় যাত্রা করেন।

এই কাহিনির মধ্যদিয়ে লেখক একদিন যেমন সামাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নির্মম চিত্র পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন তেমনি পুঁজিবাদী শোষন এর চিত্রও ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের রূপ প্রতিফলিত না হলেও ইংরেজ শাসনের ফলে গ্রামবাংলায় যে সকল ভূমি রাজস্বনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তারই নৃশংস করুণ দৃশ্যই যেন ব্যক্ত হয়েছে।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটির মধ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দমননীতির পরিচয় পাওয়া না গেলেও লেখককের, রাজনৈতিক উপন্যাগুলি রচনার সময়েই এই গল্পটিও রচিত। এই গল্পে ঠাকুরদাস মুখূজ্যের স্ত্রী অন্ত্যেষ্টি দেখে আজন্ম দুঃখী অভাগীর মনেও স্বর্গগমনের বাসনা জেগেছিল। কিন্তু অভাগী যেহেতু সমাজে খুব নীচু ঘরে বসবাস করত তাই হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুসারে তাদের মৃত্যুর পর মাটিতে পুঁতে দেওয়ার নীতি প্রচলিত ছিল। অভাগীর মৃত্যু হলে তার সন্তান কাঙ্গালী মায়ের জীবনের শেষ ইচ্ছা হিসাবে এক টুকরো কাঠ জোগার করতে গিয়ে জমিদার ও উচ্চজাতের লোকদের কাছে লাঞ্ছনার স্বীকার হয়। ফলে অতৃপ্ত বাসানাকে সঙ্গে করেই অভাগীর মৃত্যু ঘটে এবং জীবনের শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করে তার জীবনকে স্বার্থক বানানোর মত উচু আদর্শের লোকেদের অভাব সমাজে অনুভূত হয়েছিল। কাহিনির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতি না থাকলেও তৎকালীন জমিদার শ্রেণির শাসন-শোষন ও নীচ জাতির মানুষের প্রতি উচ্চজাতের মানুষের কঠোর বৈষম্য নীতি ব্যক্ত হয়েছে। অসহায়, দুর্বল মানব জাতির মধ্যে প্রতিবাদের ভাষাটুকুও জন্ম নেয়নি সেই কথাই লেখক এই গল্পে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

'হরিলক্ষ্মী' কাহিনিতে দুর্বলের প্রতি সবলের হীন ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত আছে। এই অত্যাচার যে কতখানি সীমাহীন হতে পারে তারই নিদর্শন হল গল্পটি। এখানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষনের কথা বর্ণিত না হলেও লেখক এই কাহিনিতে বিপিনের স্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসকের আদালতের উপর গরিব লোকের আস্থা নেই। সেই কথাই বর্ণনা করেছিলেন। "ইংরেজ রাজার আদালত গৃহের সুবৃহৎ দ্বার যতই উন্মুক্ত থাক দারিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই।"[২৪] তৎকালীন সমাজে ইংরেজ সরকারের শাসন ব্যবস্থার উপর যেমন সাধারণ জনগণের কোন আশা ছিল না তেমনি ইংরেজদের বিচারালয় যে কেবলমাত্র ধনিদের সৃষ্টি একটি বিচারালয় যেখানে গরীব বা নিম্ন বিত্ত শ্রেণির স্বার্থ যথার্থই নগন্য সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে এই কাহিনির মধ্যে দিয়ে। এই ভাবে শরৎচন্দ্র তার বিভিন্ন কাহিনি উপন্যাসগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা অর্থনীতি কিভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল তারও বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে লেখক জমিদার শ্রেণির হিংস্র শোষণ নীতির বর্ণনা করে ব্রিটিশ শাসক ও জমিদার শ্রেণির প্রতি তার ধিক্কার প্রকাশ করেছেন।

উপরোক্ত কাহিনিগুলি ছাড়াও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার নিদর্শন পাওয়া গেলেও লেখকের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের এক জ্বলন্ত দলিল। উপন্যাসটি বঙ্গবানী পত্রিকায় ১৩৩০-১৩৩৩ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গবাণী পত্রিকাটির পরিচালনা করতেন জাতীয়তাবাদী ব্যাঙলী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তার পুত্রগণ।

১৯২৬ খ্রীঃ ৩১ শে আগষ্ট (১৩৩৩, ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলে রাজদ্রোহীতার অপরাধে ইংরেজ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করে নেন। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে

ইংরেজ সরকার প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯২৬ সালে ২০ শে নভেম্বর পুলিশ কমিশনার বেঙ্গল গর্ভমেন্টের চীফ সেক্রেটারিকে লিখেছিলেন, পাবলিক প্রসিকিউটার অপরাধ দমন আইনের বলে গ্রন্থখানিকে বাজেয়াপ্ত করার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আওতায় গ্রন্থকারকে গ্রেপ্তার করার সুপারিশ করেছেন। (A printed copy of the book was sent to the public prosecutor, Calcutta for his opinion and he advises that the book, is liable to be prosecuted under section 124A of the I.P.C.)[25]

সেই সময় স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি ১৯২৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর চিফ সেক্রেটারিকে জানালেন যে রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে লেখা এটি প্রথম বই। এই উপন্যাসটিতে সাহিত্যিক মূল্য থাকলেও শিল্পগুণ নেই। বেশ দক্ষতা ও জোরের সঙ্গেই কিছু রাজনৈতিক মত প্রচার করা হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে লেখক ভারতবর্ষের ইংরেজ সসরকারের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিভাবে বিপ্লব আসবে এই গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা না হলেও , বিপ্লবের উপযুক্ত পরিবেশ দেশের মধ্যে তৈরী হয়নি, তবে সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অতএব এই গ্রন্থটি অপরাধদমন আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে।

তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেলের মক্তব্য শুনে চীফ সেক্রেটারি তার বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন The government of Bengal in a letter in May, 1925 in Connection with Revolutionary press propaganda in Bengal declared its intention to prosecute (the press) without regard to the probable success of the case whenever it appears to him that a definite offence has been committed, After pursuing the letter I am satisfied that the Governor in council was then considering really only the daily press-periodicals. There is no such declaration about books. In the circumstances and in view of the Advocate General's opinion I am inclined to proscribe this book "Pather Dabi" under Section 99A.C.P.C and not start a prosecution under section 12A, I.P.C. The success of a prosecution is to my mind open to question not that I disagree with the Advocate general but because in a criminal case the count might give the accused the benefit of doubt, In a case under .Section 99B, Supposing the order under Section 99A is Objected to, the proceeding will be before a special Bench of three judges and no question of punishment of the author and the printer will arise and cloud the issue whether such a publication contion's seditions matter."[26]

যার ফলে সেক্রেটারির মতামতই চুড়ান্ত হল, এবং ৪ ঠা জানুয়ারী ১৯২৭ সালে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল "১৯২২ সালে সংশোধিত ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৯৯ক ধারা অনুযায়ী গভর্ণর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত কটন প্রেস থেকে সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং উমাপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত পথের দাবী" গ্রন্থের সমস্ত কপি যেখানেই পাওয়া যাক না বাজেয়াপ্ত করলেন। কারণ এই গ্রন্থের দ্বারা ঘৃণা জাগিয়ে আইনানুগ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বীতরাগ সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২৮] এইখানে ভুল করে প্রকাশকের নাম উমাপ্রসাদের জায়গায় উমাপদ লেখা হয়েছিল। পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হলে সেই সময় বাংলায় দুই ধরনের মত সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারের অনুগামীরা এই সরকারী পদক্ষেপ সমর্থন করেন যদিও এই গ্রন্থের পক্ষে লোকের সংখ্যাই কার্যত বেশি ছিল। যার ফলে এই গ্রন্থের নিষিদ্ধ করণকে ঘিরে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদারি যারা করতেন সেই সকল ব্যক্তিরা এই গ্রন্থের বাজেয়াপ্তকরণ বিষয়ে বিভিন্ন সরকারমুখী মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তৎকালিন বহু পত্র-পত্রিকা যথা 'আত্মশক্তি' পত্রিকা, 'ফরওয়ার্ড', পত্রিকা, 'প্রবাসী', প্রভৃতিতে এই গ্রন্থের বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে সরকার বিরোধী মতামত প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র এই বইয়ের বাজেয়াপ্তকরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু দুঃখিত হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা থাকা উচিত। ১৯২৯ সালে ১৩ই মার্চ মেদিনীপুরের সাধারণ পাঠাগারের দ্বিতীয়

বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি এই বক্তব্যই রেখেছিলেন, যা ১৭ই মার্চে 'বাঙ্গালার কথায়' ছাপা হয়। তাতে বলা হয়- "সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার দেশের বর্তমান, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বলেন যে আধুনিক সাহিত্যে ইহাদের স্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে এখন অনেক নির্ভীক ভাবে মত প্রকাশ করতেন সত্য কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে এইরূপ নির্ভীকতা দেখা যায় না। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন যে বড় সাহিত্যেক বড় জাতির অগ্রদূত স্বরূপ।"[২৭]

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর অবশ্য 'পথের দাবীর' উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সেই সময় দেশের মধ্যে ক্রমাগত শ্রমিক আন্দোলন ঘটায় ইংরেজ সরকার নিরাপত্তার প্রশ্নে পথের দাবীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ সালের ৯ মার্চ বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট একটি বিজ্ঞাপিত দ্বারা 'পথের দাবী' গ্রন্থ থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন, এবং ঐ বছরই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পথের দাবী বাংলার জনগণের মধ্যে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এটি কেবলমাত্র একটা উপন্যাস হিসাবেই সেই খ্যাতি লাভ করেনি। এই গ্রন্থটি ছিল তৎকালীন যুবসমাজের কাছে একটা অগ্নিমন্ত্র বা বেদ বাক্যস্বরূপ। পথের দাবী উপন্যাস ব্যাখা করতে গিয়ে ভারতী বলেছিলেন, "আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবি অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরাপদে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্তি গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।"[২৮] পথের দাবির সভ্যদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মানুষ পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ এই পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাচার। নারীর অমর্যদা, জাতিবেদা প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলিও সেই সময় বাংলার সমাজকে কলুসিত করে তুলেছিল,মানুষের নিজস্বতা, মানুষের বিচার বুদ্ধির লোপ পেয়েছিল। ক্রমাগত না পাওয়া ফলে মানুষ তাদের নিজস্ব অধিকার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্তির পথ হিসাবে শরৎচন্দ্রের পথের দাবী উপন্যাসটি জনমানসে একটি বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস নেতাদের কাছে তা ছিল এক অবাস্তব ধারণা, হসরত মোহানি ১৯২৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু গান্ধিজি এই দাবিকে অস্বীকার করেন। শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের ব্রিটিশ ঘেঁষা নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সহিংস বিপ্লবের পথের জন্য যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগেন। তিনি তৎকালীন বহু গুপ্তসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের কাছ থেকে সহিংস বিপ্লব করার নানা পদ্ধতির কথা জানতে পেরেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মত একজন দেশনায়কের চরিত্র চিত্রন করেন। তিনি ছিলেন সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একজন বিপ্লবী। সব্যসাচী চেয়েছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্তন, তাঁর মতে বিপ্লব কোথাও আপনা আপনিই আসে না। দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যেই তার বীজ নিহিত থাকে। তাঁর মতে বিপ্লবের কাজ খুব কঠিন। এই পথে সকলই যে শেষ পর্যন্ত অংশীদার হবে সেই কথাও কখনও বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সব্যসাচী বলেছেন "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো দেশের কৃতঘ্নতা। যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচবে তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালোবাসার এই আমার পুরষ্কার।" তবুও তাদের মহৎ আদর্শ তাদের স্বরাজ স্বাধীনতার আশা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ইংরেজ সরকার ভারতের মানুষকে মূক বধিরে পরিণত করে ফেলেছিল এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ক্ষীন আশাটুকুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর এই কালজয়ী উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর মনে শক্তির বীজ বপন করেছিলেন। যে শক্তি ছিল বিপ্লবের ,পরাধীনতা গ্লানি থেকে মুক্ত করে মহান

সমাজ প্রতিষ্ঠার। পথের দাবী গ্রন্থটি পুস্তকা কারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয় তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ রক্ষা করেনি। শরৎচন্দ্রের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-"তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে বরং এই গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করণের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন "তুমি কাগজে রাজবিরুদ্ধের কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত-কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই-অপরিণত বয়সের বালক থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তত থাকতে হবে। এই কারণে সেই আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলোপ করলে সেই মূল একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।"[৩২] সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রতিবাদ করেননি, বরং ইংরেজ শাসনকেই সমর্থন করেছিলেন।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই বিরুপ মন্তব্য ও তার চিঠি শরৎচন্দ্রকে খুবই ব্যথিত করেছিল। তিনি ২রা ফাল্গুন ১৩৩৩ সালে এর প্রত্যুত্তরে একটি লিখেছিলেন কিন্তু তা তার বন্ধুদের অনুরোধে আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়নি। ঐ চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, "সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহিত পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই।.....কিন্তু বাংলাদেশের গ্রন্থাকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় তা করতেই হবে-তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়। প্রতিবাদের দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এজন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারো ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এর মত সহিষ্ণুতা নেই। এই কথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি পাছে পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে froest করার justification ও তেমনি আছে"[৩০]।

আসলে রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধিতা মূলক চিন্তাভাবনা শরৎচন্দ্রকে খুবই ব্যথিত করেছিল। কিন্তু তিনি দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি কাগজ প্রকাশে করেননি। ১৯২৭ সালে ১০ই অক্টোবর রাধারানী দেবীকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এতবড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপবার জন্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্য যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্সম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিস্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারি নে হয়ত এই কথা আমাদের মনের মধ্যে অলখ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে"[৩১]।

আসল কথা শরৎচন্দ্র সব সময় মনে করতেন কেবলমাত্র সাহিত্য রচনা করা একজন সাহিত্যিকের যথার্থ কাজ হলেও সেই সাহিত্যের যথার্থতা ও সত্যতা যাচাই করাও একজন লেখকের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি বলেছিলেন সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক সত্য ঘটনা আছে যাকে কেন্দ্র করে কোন মতেই সাহিত্য রচনা করা যায় না। তাই তিনি সাহিত্য রচনায় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ সাহিত্যিকের কাজ তার ঘটনার সত্যতাকে সমাজের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সাহিত্যিকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির বলে যে কোন

একটি ঘটনা যেমন বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে তেমনি তা সমাজের জনসাধারণের ও পাঠক সমাজের যুগযুগান্তর ব্যাপী একটি ঐতিহাসিক বিষয় হিসাবেও সমান গুরুত্বপূর্ণ থেকে যাবে। তাই শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য হল- "সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়। স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কিনা"[৩২]। শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তার আসলে লক্ষ্য ছিল জাতি গঠন ও সমাজে সংস্কার যার প্রতিফলন লেখকের প্রতিটি লেখার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। অবশ্য 'পথের দাবী উপন্যাসটি ছিল শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস গুলি থেকে সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসে তিনি বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক সমাজ, পরাধীনতা থেকে দেশবাসীকে মুক্তির কথা যোগের ভাষার ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সময় বিপ্লবীদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি এতবড় একটা সাহিত্য সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভর করেছিলেন তিনি বিপ্লবীদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর রাজনৈতিক পথের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের পার্থক্য থাকলেও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ততাকে লেখক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথকেই দেশমাতৃকার মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেছিলেন। তিনি সেই কারণে গান্ধিজিকে বলেছিলেন- "I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders."[৩৩]

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, পাঁচ হাজার কপি বিক্রী হতে সাতদিনের বেশী সময় লাগেনি। এই উপন্যাস তৎকালীন বিপ্লবী যুবসমাজের মধ্যে একটি বিরাট সাড়া ফেলেছিল। পথের দাবীর' সব্যসাচী চরিত্রটি লেখক খুবই যত্ন সহকারে অঙ্কিত করেছিলেন। তার মধ্যে একজন বিপ্লবীর যা যা গুণ থাকা দরকার সব কিছু দিয়ে তাকে একটা মহৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন সেই সময়ের সাধারণ মানুষের মানব সমাজকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল তেমনি বর্তমান পাঠক সমাজের কাছেও সমানভাবে গ্রহনীয়। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন, "সমস্ত বিপ্লবীদের জীবনের কাহিনি শুনে এবং অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে মেলামেশা করে তিনি আপন কল্পনার দ্বারা সব্যসাচীর মধ্যে বাংলার বিপ্লবীদের একটি 'টাইপ' সৃষ্টি করেছিলেন। কয়েকজন বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়া বিশেষ করে সব্যসাচীর চরিত্রে পড়েছে। দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহপ্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা এইগুণ গুলি শরৎচন্দ্র নিয়েছিলেন যতীন্দ্র মুখার্জ্জীর জীবন থেকে। ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছিলে ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ানো ও বৈপ্লবিক সংগঠনের দিকটা নিয়েছেন রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টার্যের জীবন থেকে, নানা দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে। দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলবার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী এবং আরও অনেকজনের ছাপ আছে।"[৩৮]।

পথের দাবীর মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র কেবল মাত্র ইংরেজ নয় সমগ্র ,পাশ্চাত্য সভ্যতার বীভৎস নগ্ন মূর্তি তুলে ধরেছিলেন এবং এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সব্যসাচীর মত একটি চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। তার অসাধ্য কিছু নেই সংসারে। পথের দাবী সংগঠনটি গঠনের মূল পরিকল্পনা তারই। পুলিশে ভাষার "তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না। এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর। একে চোখে চোখে রাখতে এত বড় গভর্ণমেন্ট যেন হিম সিম খেয়ে গেল।"[৩৫] ইনি হলেন রাজ বিদ্রোহী। এই তার মারাত্মক অপরাধ। সব্যসাচী তার 'পথের দাবী' দলটির মধ্য দিয়ে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার চেয়ে বড় গৌরব কোন বিপ্লবী দাবী করতে পারে না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে থেকে এই "স্বাধীনতার দাবী করা চেষ্টা করাও ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরেজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ"।[৩৬] সব্যসাচী সেই অপরাধেই অপরাধী। চিরদিন পরাধীন থাকাটাই ছিল তৎকালীন দেশীয় নেতাদের অভীপ্রায়। আমাদের

দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনই আইনের বাইরে কোনদিনই কিছু দাবি করেনি। ব্রিটিশ সরকার তাদের খুশী করার জন্য মাঝে মাঝে সংস্কার করেছে মাত্র। সব্যসাচীর ভারতবর্ষে কংগ্রেস রাজনীতির আবেদন নিবেদন নীতির উপর ভরসা ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধার কল্পে যে সকল বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন তার অন্তঃসার শূন্যতা সম্বন্ধে সব্যসাচী বলেছিলেন "চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং আইনের বাইরে এই সব প্রধান পূজ্য ব্যক্তিরা তো কোনদিন কোন কিছুই দাবি করেন না। চীনাদেশে মাঞ্চু রাজাদের মতে এদেশেও যদি ইংরেজ আইন করে দিত- সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অতএব একে সত্তয়া দুহাতে করে দেওয়া হোক"[৩৭]। তাই সব্যসাচী স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের বিপক্ষে বলেছিলেন, তারা 'বন্দেমাতরমের' দিব্যি করে ইংরেজের অধীনের স্বাধীনতা দাবি করে। আসলে এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শরৎচন্দ্র তার এই কাহিনির মধ্য দিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। অথচ তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের কাছে এটা ছিল অসম্ভব। হসরত মোহানি ১৯২৭ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রস্তাব তুলেছিলেন। মহাত্মাগান্ধি তাকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছিলেন এটা বালখিল্য প্রস্তাব। শরৎচন্দ্র তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের নীতি যে আসলে ব্রিটিশ ঘেঁষা তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সব্যসাচী বলেছিলেন "সংস্কার মানে মেরামত- উচ্ছাদ নয়। গুরুভাবে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা, যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন সংস্কার-আমার কামনায়, আমার তপস্যার আত্মবঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটি উপায় মাত্র খোলা আছে- এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা"[৩৮]।

সব্যসাচীর চিন্তা ছিল মূলত বিপ্লবের তার মতে বিপ্লব ছাড়া, হিংসার পথ ছাড়া দেশে স্বাধীনতা আসতে পারে না। তাছাড়া তিনি আরো বিশ্বাস করতেন সমাজ মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত শোষক ও শোষিত। দেশ কালের সীমানায় সমাজে এই দুটি স্তরকে কখনই আবদ্ধ করা যায় না। "এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই-হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,... আছে শুধু ধনমত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভূক্ত শ্রমিক"।[৩৯] সব্যসাচীর সমাজের সেই জায়গাতেই আঘাত করেছিলেন। শোষকদের যেমন দেশবিদেশের গণ্ডি পেরিয়েও স্বার্থগত ভাবে তাদের একজায়গায় মিল আছে, তেমনি শোষিত শ্রেণির চরিত্রও দেশকাল ভেদে অভিন্ন।। তাই শোষক শ্রেণির শক্তিকে নির্মূল করতে হলে সবদেশের শোষিত শ্রেণিকেই তার বিরূদ্ধে আঘাত করতে হবে। এই জন্যই মার্কস সকল দেশের সর্ভারা শ্রেণির ঐক্যের কথা বলেছেন।

মার্কসবাদ অনুযায়ী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় শ্রেণি। শরৎচন্দ্র এখানে কিছুটা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সব্যসাচীর মতে "আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানদের নিয়ে। মার্কসবাদ যেখানে শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের সহযোগী বলে বিবেচ্য করেছেন সব্যসাচীর মতে নিরীহ চাষা ভূষারা "কোন দেশেই স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার।...আইডিয়ার জন্য প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয় নির্বিবোধ, নিরীহ কৃষকদের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম,অশক্তির সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।"[৪০] শরৎচন্দ্র সেই সময় কৃষকশ্রেণিদের স্বাধীনতার লড়াইএ অংশীদার করেননি বরং শ্রমিক শ্রেণি তথা কলকারখানার শ্রমিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

'পথের দাবী' উপন্যাসটি মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন জড়বাদী রাজনৈতিক চেতনার পিছনে প্রচণ্ড আঘাত এনেছিলেন এবং মানুষের মধ্যে সংগ্রামমুখী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার নাম

প্রতিক্রিয়াশীলতা যা সব্যসাচীর মধ্যে ছিল না। তাই তিনি স্পষ্ট বলেন "পুরাতন মানেই পবিত্র নয় ভারতী।"[৪১] তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন প্রাচীন, জীর্ণ অকেজো জিনিসকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নতুন পথ ও জীবনের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বলে মনে করতেন। সব্যসাচী তাই কবি শশীকে এমন গান লিখতে বলেছেন যেখানে দেশের লোক নিজের দেশকে ভলোবাসতে শেখে, যাতে পূর্বের ভীরুতা, দেশদ্রোহিতা, অনুশাসন কিছুই থাকবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সব্যসাচী যে বিপ্লবের চিন্তা করেছিলেন তা ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক বিপ্লব, আর কবি শশিকে তিনি দেশাত্মবোধের গান লিখে সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর কথা বলেছিলেন। প্রকৃত অর্থে সব্যসাচীর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র যেন নিজের কথাই বলার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ বিপ্লবের মধ্যে সাহিত্যিক, শিল্পীর অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরী। তার ফলেই একটি দেশের সামগ্রীক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে। তাই সব্যসাচী কবি শশীকে বলেছিলেন "যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ন, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,- আর কিছু না পারো শশী, এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাত্ত-এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়।"[৪২]

পথের দাবীতে বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। সেই বিপ্লবের প্রস্তুতি সমাজে অনেক দিন থেকেই ঘটে। দারিদ্র্য শ্রমজীবি মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যেই তার বীজ নীহিত থাকে। ধর্মঘট বিপ্লবেরই একটি হাতিয়ার। কিন্তু যে ধর্মঘটে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক আবদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেই ধর্মঘট বিপ্লবের সহায়ক হতে পারে না। সব্যসাচী তাই বলেন। "কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না , ভারতী, একটি কিন্তু অবলম্বন তার চাই। সেই তো আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কম বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও পদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।"[৪৩] বিপ্লবের মধ্য দিয়েই যথার্থ কুলি মজুরদের ভালো করা যায়। তাই শরৎচন্দ্র এই বিপ্লবের সমর্থনের মধ্য দিয়ে পথের দাবীর সৃষ্টির কথা বলেন। বিপ্লব মূলত হয় হিংসাত্মক। হিংসা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দেশের স্বাধীনতার পথকে অর্জন করে নেওয়ার কথা লেখক দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এই ভাবে শরৎচন্দ্র ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতি থেকে সরে এসে সশস্ত্র পথে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি ঘটিয়ে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের পথে উদ্বুদ্ধ করেন। এই ভাবে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিয়ে যেমন তৎকালীন যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে এই বইটি হয়ে উঠেছিল ভারতীয়দের আন্দোলনের একটি হাতিয়ার। এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র যুব সমাজ বইটিকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মেনে নেন। এই বই তৎকালীন ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে একটি আলাদা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় শরৎচন্দ্র রচিত সমস্ত উপন্যাসেই সমাজ পরিবর্তন একটা বার্তা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলেও তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি তৎকালীন যুবসমাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকের শুরু করে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে এক আলাদা উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে যেমন এই রচনাগুলি সচেতন করে তোলে তেমনি দেশমাত্রিকার মুক্তির জন্য কোন্ কোন্ পথ অবলম্বন করা যায় তারও একটা সম্যক ধারনা লেখক দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর পক্ষে রাজনীতির মধ্যে থেকে দেশের রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করা যতটা সহজ ছিল, তৎকালীন মূক বধির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আঘাত করা ততটা সহজ ছিল না। কিন্তু সেই কাজটি লেখক খুবই সচেতনভাবে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বুঝোছিলেন দেশমাত্রিকার মুক্তির জন্য যেমন শ্রেণির মানুষের সমান অধিকার থাকা দরকার, তেমনি দরকার মানুষের শিক্ষা, বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার মত উপযুক্ত মানসিকতা। যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ কেবলমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবে না, সেই রাজনৈতিক আদর্শকে যুক্তি সহকারে মানার মত বিচার বুদ্ধি ও প্রয়োগ করার মত উচ্চ মানসিকতা গঠনের কথাও লেখক দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। এই ভাবেই

গড়ে উঠবে একটি উন্নত শিক্ষিত, সমাজব্যবস্থা। যা একাধারে মানুষকে যেমন দেবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তেমনি মানুষকে সামাজিক ভাবে মুক্ত স্বাধীন ভাবে চিন্তাধারা গঠনে অগ্রনী ভুমিকা গ্রহণে সাহায্য করবে। তাই লেখক স্বাধীনতার মানে পরাধীনতা থেকেই মুক্তির কথা বলেননি। এর পিছনে ছিল তার বৃহত্তর চিন্তাধারা যার ফসল লেখকের বিভিন্ন সাহিত্যরচনাগুলি। সেখানে সমাজ গঠনের কথাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। মিত্র ডঃ সরোজ মোহন, শরৎ সাহিত্যে সমাজ চেতনা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৪৯।
২। প্রভাকর বিষ্ণু, ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়াল, কলকাতা ১৪১৭, পৃঃ ১৬০।
৩। বসু সুদীপ, উদভাসিত শরৎচন্দ্র, পত্রে ও সাময়িক পত্রে, কলকাতা ২০০০ পৃঃ ২৮৬।
৪। চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, (দ্বিতীয়খণ্ড), পৃঃ১৬২।
৫। দে সরকার পুলকেশ, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা, দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, কলকাতা ১৩৮৩, পৃঃ ১০৫।
৬। পূর্বোক্ত, প্রভাকর বিষ্ণু, পৃঃ ১৬৪।
৭। চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র (তৃতীয়খণ্ড) পৃঃ ৪৮০?
৮। পূর্বোক্ত, বসু সুদীপ, ২৮৭।
৯। পূর্বোক্ত, প্রভাকর বিষ্ণু, পৃঃ ১৬৯।
১০। রায় গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সাহিত্য সদন, কলকাতা, পৃঃ ৮৩
১১। পূর্বোক্ত, বসু সুদীপ, পৃঃ২৯৩।
১২। ঘোষ অজিতকুমার, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, দেজ পাবলিশিং ১৯৯১, কলকাতা, পৃঃ ৩৭০।
১৩। পূর্বোক্ত, বসু সুদীপ, পৃঃ ৩২৫।
১৪। শরৎচন্দ্র (প্রথমখণ্ড) পৃঃ
১৫। তদেব ৩য় খণ্ড পৃঃ২৯০।
১৬। তদেব ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৯১।
১৭। তদেব ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৯০।
১৮। তদেব ৩য় খণ্ড পৃঃ২৮৮।
১৯। পূর্বোক্ত, মিত্র ডঃ সরোজ মোহন, পৃঃ ১৩৯।
২০। পূর্বোক্ত, চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪৭।
২১। তদেব পৃঃ ১৫০।
২২। তদেব পৃঃ ২৩১।
২৩। তদেব পৃঃ ৩৩১।
২৪। তদেব ৩য় পৃঃ ২৫৫।
২৫। তদেব পৃঃ ১৫০।
২৬। পূর্বোক্ত মিত্র ডঃ সরোজ মোহন, পৃঃ ১৩৮।
২৭। তদেব পৃঃ ১৫৮।
২৮। তদেব পৃঃ ১৫৬।

২৯। তদেব পৃঃ ১৬১।
৩০। তদেব পৃঃ ১৬১।
৩১। তদেব পৃঃ ১৪০।
৩২। তদেব পৃঃ ২৬৯।
৩৩। তদেব পৃঃ ১৬৯।
৩৪। তদেব পৃঃ ১৭০।
৩৫। তদেব পৃঃ ১৭০।
৩৬। পূর্বোক্ত চট্টোপাধ্যায় শচীনন্দন, পৃঃ ১০১-১০২।
৩৭। তদেব পৃঃ ১১২।
৩৮। পূর্বোক্ত চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১৫০।
৩৯। তদেব পৃঃ ১৫১।
৪০। তদেব পৃঃ ১৭০।
৪১। তদেব পৃঃ ১৮০।
৪২। তদেব পৃঃ ১৫৬।